গ্রিন রেলওয়ে - আগামীর প্রতিশ্রুতি

রেজাউল করিম সিদ্দিকী

দেশের গণপরিবহণ মাধ্যমসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের রেলওয়ে সরকারের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ খাত। এ দেশে প্রথম রেলওয়ের সূচনা হয় ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর দর্শনা থেকে জগতি পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৮৭৭ কিলোমিটার রেল লাইন নেটওয়ার্ক দেশের ৪৪টি জেলায় সংযুক্ত। ১৯৪৭ সালের পূর্বে অবিভক্ত ভারতবর্ষে রেলওয়ে বোর্ডের মাধ্যমে তৎকালীন রেলওয়ে পরিচালিত হতো। ১৯৭৩ সালে বোর্ডের কার্যক্রম বিলুপ্ত করে একে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে রেলপথ বিভাগ গঠন করা হয়। রেলপথ বিভাগের সচিব, ডিজি কাম সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ে অথরিটি (বিআরএ) গঠন করা হয়। তবে গঠিত বিআরএ এর কার্যক্রম পরবর্তীতে অব্যাহত থাকেনি। ১৯৯৬-২০০৩ সময়কালে এডিবি এর অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। এরপর যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সড়ক ও রেলপথ বিভাগ হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। গণমানুষের চাহিদা ও সময়ের দাবিতে ২৮ এপ্রিল ২০১১ তারিখ সরকার যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতায় রেলপথ বিভাগ নামে নতুন বিভাগ সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। 'অ্যালোকেশন অব বিজনেস' অনুসারে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি : রেলওয়ে এবং রেল পরিবহণ ও নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ ও কৌশল প্রণয়ন, বাংলাদেশ রেলওয়েসহ রেল সংক্রান্ত পরিবহণ মাধ্যমসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেলযোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন, রেল পরিবহণ সংক্রান্ত জরিপ ও পরিবীক্ষণ, রেল পরিবহণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক রেলপরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিবহণ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভাড়া ও টোল নির্ধারণ এবং পুনর্নির্ধারণ, বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন ও বিনিয়োগ প্রোগ্রামসমূহ এবং রাজস্ব বাজেট সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা ইত্যাদি।

মোট ২৫ হাজার ৮৩ জন নিয়মিত কর্মচারী ও বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ২৯৫৫.৫৩ কিলোমিটার রুট রয়েছে। দেশের বিভিন্ন রুটে বর্তমানে ১২২ টি আন্তনগর এবং মেইল ও কমিউটার মিলে প্রতিদিন মোট ৩৯১টি ট্রেন চলাচল করে। এসব ট্রেনের বেশির ভাগের অকুপেন্সী শতভাগের বেশি। আন্তনগর ট্রেনে প্রতিদিন মোট প্রায় এক লাখ ত্রিশ হাজার ও অন্যান্য মিলে প্রতিদিন প্রায় আড়াই লাখেরও বেশি যাত্রী চলাচল করে যা থেকে রেলের প্রতি দিনের গড় আয় আট কোটি টাকারও বেশি। এছাড়া পণ্য পরিবহণের মাধ্যমেও রেল বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় করে থাকে।

গত ১৫ বছরে রেলের অবকাঠামো খাতে ব্যয় হয়েছে ৮৬ হাজার কোটি টাকা। ২০০৯ সালের জুন থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে ৮৯টি প্রকল্পে ব্যায় হয় ২১ হাজার ৭৮ কোটি টাকা এবং চলমান ৩২টি প্রকল্পে বছর এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত খরচ ৬৬ হাজার ৮৫৩ কোটি টাকা। এসময়ে মোট ব্যয় হয়েছে ৮৭ হাজার ৯০১ কোটি টাকা। গত দশ বছরে রেলের উন্নয়নে ২০ হাজার কোট টাকা বিনিয়োগ করা হলেও রেলের কোচ (বগি) যাত্রী অনুযায়ী বাড়েনি। এজন্য প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ যাত্রী টিকিট না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে খুব দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি বলে সংশ্লিষ্টদের অভিমত। আশার কথা হলো রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন যে রেলের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যারেজ (বগি) ও লোকোমোটিভ (রেল ইঞ্জিন) সংগ্রহের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগে একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইতোমধ্যে তাদের আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকোমোটিভ ও ক্যারেজ বাংলাদেশ রেলওয়েতে যুক্ত করা যায় তবে রেল তথা সরকারের আয় যেমন বাড়বে, সাধারণ যাত্রীরাও তেমনি অধিক হারে নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ ও সাশ্রয়ী ভ্রমনের সুযোগ পাবে। অন্যদিকে সড়কে যাত্রী পরিবহণ হ্রাস পাবে। যেহেতু সড়কপথের চেয়ে রেলপথে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ও হার কম, তাই সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানীও কমবে উল্লেখযোগ্য হারে।

সম্প্রতি পদ্মাসেতু হয়ে ঢাকা থেকে খুলনা-যশোর-বেনাপোল রুটে ট্রেন চলাচল চালু হওয়ায় এ রুটে যাত্রার খরচ ও সময় প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। পূর্বে ঢাকা থেকে রেলযোগে খুলনা যেতে হলে যমুনা সেতু –ঈশ্বরদী হয়ে যেতে হতো। ফলে দীর্ঘ ৬৫৫ কিলোমিটার পথ ঘুরে যেতে যাত্রীদের আট ঘন্টারও বেশি সময় লেগে যেতো। এতে প্রত্যেক যাত্রীকে ভাড়া বাবদ টাকাও দিতে হতো অনেক বেশি। বর্তমানে ঢাকা থেকে পদ্মাসেতু হয়ে খুলনা যেতে সময় লাগছে মাত্র পৌনে চার ঘন্টা। যাত্রী প্রতি সকল শ্রেণির আসনে ভাড়াও কমেছে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের কাছাকাছি। এছারা যনুনা রেলসেতু হয়ে ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ায় ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গের সকল ট্রেনের যাত্রার সময় কমেছে পনেরো মিনিটেরও বেশি। অন্যান্য রুটেও বিভিন্ন সংস্কার, মেরামত ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের ফলে রেলযাত্রা হয়েছে পূর্বের চেয়ে অনেক আরামদায়ক, নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও দ্রুত। ফলে রেল যাত্রায় যাত্রী ঈদ চাহিদা অনেক বেড়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এ চাহিদা আরও কয়েকগুণ বাড়তে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

নিরাপদ, বিশ্বস্ত, আরামদায়ক এবং তুলনামূলক কম খরচে দ্রুত যাতায়াতের মাধ্যম হওয়ায় রেলওয়েকে গ্রিন ট্রান্সপোর্ট হিসেবে গণ্য করা হয়। এর মাধ্যমে কম জ্বালানি ব্যবহার করে অধিক সংখ্যক যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ করা যায়। টেকসই উন্নয়নের মূল লক্ষ্যই হলো পরিবেশকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদাকে বিনষ্ট না করে উন্নয়ন সাধন করা। রেল পরিবহণ প্রকল্প গ্রহণকালে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সহনশীলতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে কতিপয় বিষয় যেমন বায়ুপ্রবাহ , লবণাক্ততা, ভূমিক্ষয়, ভূমিধস, বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপাতজনিত ক্ষতি সহনীয় কি না তা বিবেচনা করা। তাছাড়া বৈদ্যুতিক টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম

ক্ষতিগ্রস্ত/বাধাগ্রস্ত হবে কি না অথবা তাপীয় প্রসারণের কারণে ব্রিজ সংযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না তাও বর্তমানে লক্ষ্য করা হচ্ছে। রেল লাইনের দুই ধারে বনায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া সৌরশক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সকল অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পে পরিবেশগত বিষয়সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো হাতি চলাচল নির্বিঘ্ন রাখার জন্য 'এলিফ্যান্ট পাস' স্থাপন করা হয়েছে। কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও মানোন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও নতুন রোলিং স্টক সংগ্রহ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমানোর লক্ষ্যে লোকোমোটিভ সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'টায়ার-২' এবং তদূর্ধ্ব বৈশিষ্টসম্পন্ন লোকোমোটিভ এবং বায়োটয়লেট সুবিধাবিশিষ্ট কোচ সংগ্রহ করা হচ্ছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেল লাইনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স ফর গ্রিন ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেশন ফ্যাসিলিটি' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলদেশ রেলওয়ে ইলেক্ট্রিক ট্র্যাকশন প্রণয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রুটে ইলেক্ট্রিক ট্র্যাকশন প্রবর্তিত হলে যাত্রা সময় ও খরচ যেমন সাশ্রয় হবে তেমনি ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন চালুকরণের ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানোও সম্ভব হবে। পূর্বাঞ্চল মিটার গেজ এবং পশ্চিমাঞ্চলে ব্রড গেজ রেল ট্র্যাক ইতোমধ্যে ডুয়েল গেজে রূপান্তর করা হচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইনে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকারি অর্থায়নে বিশদ নক্সাসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পাইলট প্রকল্প হিসেবে নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-জয়দেবপুর লাইনে ইলেট্রিক ট্র্যাকশন প্রবর্তনসহ ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ইএমইউ) ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে টঙ্গী থেকে চট্টগ্রাম এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে লাকসাম লাইনে ইলেট্রিক ট্রাকশন প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া, অন্যান্য লাইনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষাকালে ইলেট্রিক ট্রাকশন প্রবর্তনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এতে একদিকে রেল ইঞ্জিনের কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাবে, মানুষ কম খরচে স্বল্পতম সময়ে নিরাপদে গন্তব্যে পৌছাতে পারবে।

#

পিআইডি ফিচার